রবীন্দ্র কবিতার বিপরীত স্রোত : যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল

ড: কাননবিহারী ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রসঙ্গ : দ্বিতীয় সংস্করণ

'রবীন্দ্র কবিতার বিপরীত স্রোত ঃ যতীন্দ্রনাথ মোহিতলাল' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা বইমেলা ১৯৯৮ জানুয়ারিতে।

সম্প্রতি বইটির প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণে আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়ায় বইটির পরিমার্জন তথা সংযোজনের সুযোগ এসে গেল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (অধুনা মাননীয় কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার) অগ্রজপ্রতিম গ্রন্থকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু সংযোজন বিষয়ক প্রস্তাব দিয়ে বইটির প্রচার সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে বইটির সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের প্রয়াস নেওয়া হল।

অনুজপ্রতিম ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর সুচিন্তিত প্রস্তাব ও পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পুনশ্চ প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে খেদের সঙ্গে জানাই যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকালে বইটির মুদ্রিত একটি খন্ড সানন্দে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ও পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত মহাশয়ের হাতে তুলে দিতে পেরে সন্তোষ লাভ করেছিলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে একথা স্মরণ করে নিদারুণ বিষন্নতাবোধ মনকে আচ্ছন্ন করছে। কারণ ইতিমধ্যে অমোঘ জাগতিক বিধান মেনে তাঁর লোকান্তর ঘটেছে।

তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

কাননবিহারী ঘোষ
দেবীপক্ষ, ১৪১৮

ভূমিকা

কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক যুগস্রষ্টা। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিরলস সাহিত্যপ্রয়াস বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলোকে নানাভাবে পল্লবিত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বৎসর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ—কিন্তু তার কয়েক বছর আগে থেকেই ক্রমশ বাঙ্গালি মানসের মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে উত্তরণ সূচিত হচ্ছিল।

এই পর্বের উল্লেখ্য, তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলিই সম্ভবত এরজন্য দায়ী। ঐতিহাসিক সেইসব ঘটনাগুলোকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে।

এক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭)। দুই, শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন। তিন, নীলকরের হাঙ্গামা ও শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর প্রতিবাদ—তার প্রভাব। চার, বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে সাঁওতাল বিদ্রোহ। পাঁচ, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোধান। ছয়, কবি মাইকেল মধুসূদন ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব। সাত, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ইত্যাদি।

বাংলার এই নবজন্মের প্রত্যুষলগ্নে কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি প্রয়াসের সময়-কালরূপে ১৮৭৮, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ ঐ সময় কবিকাহিনী (১৮৭৮) এবং বনফুল (১৮৮০) প্রকাশিত হয়। অবশ্য কবির মৌলিকতাসূচক কাব্যের জন্য আমাদের 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর প্রকাশকাল (১৮৮৩) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নয়, মূলতঃ রবীন্দ্রকাব্যের বিপরীত ধারা নিয়ে পর্যালোচনায় কেন ব্রতী হয়েছি প্রসঙ্গত সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে কবি রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন যুগ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে, রবীন্দ্র সমসাময়িককালেই বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রবিরোধী কিছুভাব ও ভাবনার সূচনা হয়। উক্ত বিষয়টিকে অতি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী, কল্পনা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর যখন রবীন্দ্রপ্রতিভা নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বিশ শতকের সেই প্রবল দশকে রবীন্দ্রবিরোধী একটি দল বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করছিল। রবীন্দ্রবিরোধী এইসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। রবীন্দ্র কাব্যের আদর্শ পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত, এই সাহিত্য অস্পষ্ট, ভাববস্তু—বস্তুতন্ত্রতাহীন। এর প্রকাশরীতির ভাষা খাঁটি বাংলাভাষা নয় ইত্যাদি।

রবীন্দ্রবিরোধী ওই সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৎকালীন বাংলা কাব্যাসরে এক বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের এই সক্রিয় রবীন্দ্র বিরোধিতা পরবর্তীকালে রবীন্দ্র বিরোধী চিন্তাশ্রয়ী বেশ কিছু কবিদের জন্ম দিয়েছিল।

মূলকথা হল রবীন্দ্র সমসাময়িককালে রবীন্দ্র বিরোধী কাব্যধারা সমান্তরালভাবে চলছিল। তারই সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্র বিরোধী স্রোতটাকে নির্বিশেষভাবে অনুসরণ না করে বিশেষ দু'জন কবির বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছি। এঁদের একজন হলেন জড়বাদী কবি যতীন্দ্রনাথ (১৮৮৭-১৯৫৪) ও অন্যজন হলেন দেহবাদী কবি মোহিতলাল (১৮৮৮-১৯৫২)।

নদীগতিপথ পাল্টায়—কাব্যও একই গতিপথকে অনুসরণ করে না স্থায়ীভাবে। তারই নজির হিসেবে রবীন্দ্র বিরোধী কাব্যধারার কথা উল্লেখ করা যায়।

এই কাব্যধারার মুখ্য কবিদ্বয়ের (যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলালের) কাব্যরচনা প্রয়াসের সময়কাল বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশক, তৃতীয় দশক কিংবা চতুর্থদশকের প্রথম পর্যন্ত। এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে—ভাব ও ভাষার দিক থেকে।

পরিশেষে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল কেউই পুরোদস্তর রবীন্দ্র বিরোধী থাকতে পারেননি।

দুই

সুদীর্ঘদিন শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী থেকেছি। স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়েছে কর্মের তাগিদে। স্বভাবতই সুযোগ অভাবে কিংবা পরিস্থিতি পরিবেশে পড়াশুনার জগৎ থেকে কিছুটা দূরে চলে গেছি। এরই মাঝে হঠাৎ যখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর তপোবিজয় ঘোষের নিকট থেকে গবেষণার জন্য তাগিদ আসতে থাকে—তখন উৎসাহ বোধকরি। যে কবি ব্যক্তিত্বের উপর গবেষণা করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন— সেটি হল কবি যতীন্দ্রনাথ।

উৎসাহিত হয়ে ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে গবেষণার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আবেদন জানাই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়ে গেছে—বিশ্ববিদ্যালয় আহুত গবেষণা সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিম্নরূপভাবে স্থিরীকৃত হয়—"রবীন্দ্র কবিতার বিপরীত স্রোত ঃ যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল।" আমার পরম শ্রদ্ধা-ভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজিতকুমার দত্ত মহাশয় তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য সম্মতি প্রদান করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের প্রথমশিক্ষা বর্ষে (১৯৬০-৬২) আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে (২৬/২৭ বৎসর) আমাকে বিস্মৃত না হয়ে তিনি যে গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সম্মতি দিলেন বা গবেষণা চলাকালীন নির্দেশাদি দান করেছেন—এজন্য তাঁর নিকট আমি চিরঋণী। তাঁকে সভক্তি প্রণাম জানাই।

রচনাটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত হয়েছে

এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এইসঙ্গে গবেষণা কার্যটির মৌখিক পরীক্ষা (Viva-Voce) গ্রহণের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার মাননীয় ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় যে সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন বা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগের প্রধান লণ্ডন প্রবাসী এবং সম্প্রতি কয়েক বছর পূর্বে স্বর্গত ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়কে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাই। কারণ সেই প্রথম শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ে ঔৎসুক্য, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সঞ্চার তিনিই করেছিলেন।

অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় বয়সে মানুষের মন যখন ক্রমশ বিষয়ী এবং হিসেবী হয়ে ওঠে তখন নিজেকে গবেষণামুখী করা প্রায় অসম্ভব। এই অসম্ভব আমার জীবনে সম্ভব হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার অনুজপ্রতিম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য। শ্রীমান চট্টোপাধ্যায় আমার সতীর্থ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষের (১৯৬১-৬৩) কৃতী ছাত্র ও খ্যাতিমান গবেষক। তিনি আমাকে অগ্রজরূপে যেমন সমীহ করেছেন তেমনি হাস্যমুখে ও অক্লেশে গবেষণা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশ দান করেছেন। তখন কে বলবে তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গবেষক। আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা কাব্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতীবীথি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া তারাবাগের অধ্যাপক আবাসে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্র ব্যবহার করতে দিয়ে পরিজনসুলভ ব্যবহারের একবিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। অবশ্য তিনি আমার শিক্ষণ সাথীও (বি. টি. ট্রেনিং মেট) ছিলেন। সুতরাং উভয়ত, ধন্যবাদার্হ।

পরিতাপের বিষয় এই যে গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যখন ব্যাপক জল্পনাকল্পনা চলেছে তখন অকস্মাৎ আমার মাতৃবিয়োগ ঘটে। আমার গ্রন্থমুদ্রিত আকারে তিনি দেখে যেতে পারলেন না এ খেদ্, চিরকাল থেকেই গেল।

এছাড়া বহু বিদগ্ধজনের সাহচর্যে ও আলোচনা মারফৎ আমার সীমিত চিন্তাধারাকে প্রসারিত করতে পেরেছি। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

'পুনশ্চ' প্রকাশনার কর্ণধার শ্রীযুক্ত শঙ্করীভূষণ নায়ক এককথায় বইটি প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

সংসারের নানান খুঁটিনাটি থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে একাজে পরোক্ষ সাহায্য আরও একজন করেছে, কিন্তু সে আমার কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না।

নিবেদনমিতি
কাননবিহারী ঘোষ

জানুয়ারি, ১৯৯৮
পর্বতপুর, বর্ধমান-৭১৩৪০৮

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়	কবি রবীন্দ্রনাথ	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	রবীন্দ্রকবিতার বিপরীত স্রোতের পটভূমি	৪১
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলাকাব্যে রবীন্দ্র বিরোধী স্রোতের পটভূমি	৭১
চতুর্থ অধ্যায়	কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৮১
পঞ্চম অধ্যায়	কবি মোহিতলাল মজুমদার	১৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	ভাষাবিচার ঃ তৌলন আলোচনা	২১২
	গ্রন্থপঞ্জি	২৫৯

প্রথম অধ্যায়

কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন—অপরূপ বিশ্ববন্দিত কবি। রবীন্দ্র প্রজ্ঞা, রবীন্দ্র প্রতিভা তাঁর সৃষ্টির ব্যাপক বৈচিত্র্য নিয়ে স্তম্ভিত করে দেয় পাঠক মনকে।

"Rabindranath Tagore is a Phenomenon. If nature manifest in the even light of the sun, forsook the forms of fields and hills and trees and flowered in words, that indeed, were he. There has not been a greater literary force, or a greater force like nature's expressing itself in literature....What I am thinking of as Rabindra Nath's unique merit is his quantity. his immense range, his fabulous variety."[১]

রবীন্দ্র সৃষ্টিও বহুধা। কাব্য, গান, নাটক, উপন্যাস সবকিছুর মধ্যে তিনি দেখাতে পেরেছেন এক অভিনবত্ব। অশ্রুতপূর্ব চিন্তা ও ভাবের স্ফূরণ ঘটেছে তাঁর রচনায়।

রবীন্দ্র আবির্ভাবের পূর্বে মধুসূদনের বজ্রবাহুর আলোড়নে বাংলা কাব্যের মথিত সাগরের মধ্যে থেকে যে ভাণ্ড উঠেছিল তা মূলত ক্লাসিক রসাশ্রিত। সমকালীন কোন ঘটনা বা দেশকালের উল্লেখ্য পরিবর্তন তাঁর কাব্যে ধরা পড়ে নি। যদিও আধুনিকতার সূচনা তাঁর কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়।

একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে কবি বিহারীলাল বাংলা কাব্যের বিশুদ্ধ গীতি-কবির স্রষ্টা। যদিও ইতিপূর্বে বৈষ্ণবপদাবলীর গানে গীতিধর্মী কাব্যের পরিচয় পাই তবু তাকে ঠিক আত্মলীন সঙ্গীত বলা যাবে না। কারণ তা বস্তু নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ছিল না।

কবি বিহারীলালের সঙ্গীত শতক (১৮৬২) রচনার পর থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বিহারীলালের ঘনিষ্ঠতার সূচনা ঘটে। ক্রমে তিনি সে বাড়ির কাব্য রসিক সকলেরই চিত্তহরণ করেছেন। ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় যখন বিহারীলালের কবিতা পাঠ চলত তখন সে বাড়ির এক কিশোর ভাবীকালের মহৎ কবিত্বের প্রেরণা লাভ করতেন। তিনি হলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধচিত্তে এমনি করেই বিহারীলাল শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

"সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্য কুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি 'ভোরেরপাখী' সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারিনা কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম.....

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন।
চারিদিকে ঝালা ফালা
উঃ জ্বলন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধহয় কবির নিজের কথা।"[১]

বিহারীলালের কাব্য কবিতায় রোমান্টিক ও লিরিক ধর্মের যে সমন্বয় দেখা যায়—বাংলা সাহিত্যে তা পরিপূর্ণরূপে প্রকট হয়েছে রবীন্দ্র কাব্যে। রবীন্দ্র কাব্যের প্রাথমিক পর্বের কেন্দ্রমূলে বিহারীলালের প্রেরণা সহজেই অনুধাবন যোগ্য। নিখিল বিশ্বের মূলীভূত কারণস্বরূপ সৌন্দর্যসত্তার বন্দনা বিহারীলাল করেছেন। সারদা তারই প্রতিমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্য সত্তার বর্ণনা করেছেন কখনও উর্বশীরূপে কখনও লীলা সঙ্গিনীরূপে। উর্বশীর মধ্যে যে Eternal beauty এবং Eternal Soul-কে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—তার প্রথম আভাস বিহারীলালের সারদার মধ্যে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। বিহারীলালের মিষ্টিক দৃষ্টি সারদাকে অবলম্বন করেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক দৃষ্টির পরিপূর্ণতা দেখি আরও অগ্রসর হয়ে জীবন দেবতায়। কবি বিহারীলালের মারফৎ পাশ্চাত্য রোমান্টিসিজম্ রবীন্দ্রনাথে সঞ্চারিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মানসভূমি প্রস্তুতিতে আর যে বিষয়কে গণ্য করা হয় তার মধ্যে উপনিষদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপনিষদের পরিবেশই কবিকে বা কবিমানসকে লালন করেছিল। বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত অখণ্ড ঐক্যে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মূলত উপনিষদের প্রভাব নয়। এটা রবীন্দ্রনাথের সহজাত বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস উপনিষদের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায় ও লেখার মধ্যে বসুন্ধরার সঙ্গে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একটা বিশেষ একাত্ম বোধের পরিচয় পাই। এই যে অদ্বয়বোধ—কোন কোন ক্ষেত্রে উপনিষদের অধ্যাত্মবোধের অনুরূপ কোথাও তা উপনিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত। মানসী কাব্যের অন্তর্গত 'অহল্যার প্রতি' সোনারতরীর 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় কিংবা চৈতালীর 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় এইসব ভাবের রূপায়ণ দেখি। 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' এর মধ্যেও এই ভাব লক্ষ করা যায়। যদিও এর সঙ্গে যুক্ত আছে বিবর্তনবাদ।

উপনিষদের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাই মানুষের দুটি সত্তার কথা এই দ্বৈতসত্তা হল, একটি আত্মা অপরটি আত্মার সহচর অহং।

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের মিল লক্ষ্য করিবার অন্য একটা দিক আছে; প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে, দিকটা শুধু প্রভাব বিচার করিবার নয়, দিকটা হইল বিশেষ করিয়া মিল লক্ষ্য করিবার অর্থাৎ উপনিষদগুলির মধ্যে প্রকাশিত যে—মন আর রবীন্দ্রনাথের মন, এই উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে একটা অত্যন্ত সহজ ও আশ্চর্য মিল; সে মিল আশ্চর্য এই জন্য যে অন্ততঃ তিন সহস্রাধিক কালেরই ব্যবধান অতিক্রম করিয়াও এ মিল দেখা দিয়াছে অতি ঘনিষ্ঠ অথচ সহজভাবে।"[২]

প্রভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবে ও ভাষায় কালিদাসের প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

"আরো একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের

'মন্দাকিনী-নির্ঝর-শীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্ট-মৃগৈঃ কিরাতৈ—
রাসেব্যতে ভিন্নশিখন্ডিবর্হঃ।'

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনী নির্ঝর-শীকর' এবং 'কম্পিত দেবদারুঃ' এই দু'টি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রসভোগ করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মনখারাপ হইয়া গেল। মৃগ অন্বেষণ তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকে চিরিয়া চিরিয়া ভাগ ভাগ করিতেছে, এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।[৫]

এই শ্লোকটির সমগ্রতার মধ্যে যে অখণ্ড সঙ্গীত আছে, সেই সংগীতই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে—তাঁর কবিধর্ম আত্মীয়তা অনুভব করে।

রবীন্দ্রনাথের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য বলতে প্রধানত কালিদাস এবং প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা বলতে উজ্জয়িনীর জীবনযাত্রা বোঝায়। কবি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই আমরা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের চিররহস্যময়পুরী উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করি—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে,
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।'

"রীতিমত সংস্কৃত পড়বার আগে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি কাব্যের কিছু রস আস্বাদন করেছিলেন। সে কাব্য মেঘদূত। সংস্কৃত শিখে রবীন্দ্রনাথ—'মেঘদূত' ভালো করে পড়েছিলেন এবং বারবার পড়েছিলেন। মেঘদূতকে রবীন্দ্রকাব্যের গীতা বললে অন্যায় হয় না।"[৬]

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্বে ভানুসিংহের পদাবলী লিখবার সময়ে কবি গভীরভাবে বৈষ্ণব কবিতা অধ্যয়ন করেছিলেন।

'পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলী মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ-চেষ্টা করিয়াছিলাম।'[৭]

এই অধ্যবসায়ের ফল প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভানুসিংহের পদাবলী রচিত হল। পরোক্ষ ফল আরও ব্যাপক। বৈষ্ণব কবিতার বিশুদ্ধ লিরিকের স্পর্শে রবীন্দ্রকাব্যের জড়তা কেটে গেল।

"বৈষ্ণব কবিদের বিশুদ্ধ লিরিকের সোনারকাঠির স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পূর্বে যে জড়তা যে সংস্কার ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাহার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তাঁহার অন্তর্জীবনে কিন্তু কবির শিল্পজীবনে সেই সূর্যরশ্মিকর বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীর

স্পর্শরূপ বাংলার গীতিকবিতার ঝঙ্কার; আর সেই তুষারাহত নির্ঝর তাহার পূর্ব সংস্কারবন্ধে বন্দিনী গীতিকবিতা।'[৭]

ভাবের কথা বাদ দিলেও ভাষা প্রসঙ্গে কালিদাস ও জয়দেবের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে পরিলক্ষিত হয়।

'ভাবের কথা ছেড়ে দিই। গীতগোবিন্দের পরেই মেঘদূতের শব্দ ছায়া রবীন্দ্রকাব্যের ভাষায় কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। তবে এ ছায়া গীতগোবিন্দের তুলনায় ফিকা। তার অনেক কারণ আছে। তবুও কালিদাসের বিশেষ করে মেঘদূতের ভাষা প্রভাব রবীন্দ্র ভাষায় দুর্লক্ষ্য নয়।'[৮]

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক শব্দভাণ্ডারের এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা তিনি পেয়েছিলেন 'বৈষ্ণব কবিতাবলী' ও জয়দেব থেকে।

বাংলা রেনেসাঁসকে ভারতীয় রেনেসাঁসের পথিকৃত বলা যায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় ভারতীয় রেনেসাঁস বাংলা রেনেসাঁস থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে। ইয়োরোপের রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালীর যেমন ভূমিকা বাংলা রেনেসাঁস বাংলার মাটিতে সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এদেশের রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, আপনাকে জান আর আপনাকে জানাও। এই আপনাকে জানা থেকেই এল ঐতিহাসিক গবেষণা, এল ভারতের ইতিহাস জানার আগ্রহ। বাইরে আলোড়ন আন্দোলনের অন্তরালে ভারতের মানস প্রকৃতিতে যে একটা সর্বব্যাপক অন্তঃসলিল চিন্তাভাবনার প্রবাহ চলে আসছে উপনিষদের যুগ থেকে সেইটাকে জানার আগ্রহ সারা ভারতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম দেখা দিল। জীবন চর্যায় আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি; আমরা যে পড়ে পড়ে মার খেয়েছি তার কারণ জানতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে, আমাদের ইতিহাসকে জানতে হবে। ভারতের যে ইতিহাস আমরা পড়ি সেটাকে ইতিহাস বলা চলে না, সেটা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাস নয়, একটা গোটা জাতির ইতিবৃত্তান্ত জানা চাই।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ইতিহাসের পরিচয় এসেছে বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার অবকাশ নিয়ে। অন্যান্য দেশের সভ্যতার মূলে যেমন জাতি সংঘাত ছিল ভারতবর্ষে তেমনি ছিল বর্ণসংঘাত; কিন্তু কাউকে ত্যাগ না করে বিরোধমূলক ঐক্যের পরিবর্তে যে একটা মিলনমূলক সংঘাতকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ সমাজ গঠন করে এসেছে—সেই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ প্রথম উচ্চারণ করেন। একচ্ছত্র ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের নানাজাতি প্রকারান্তরে একটি মাত্র জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভারতের রেনেসাঁস আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এটা গ্রহণ করেছে।

ভারতের যে সনাতন ঐতিহ্য অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ দর্শন, সুফীবাদ, কবীরবাদ, বৈষ্ণববাদের মিলিত বা পাশাপাশি অবস্থিত ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্রে নতুন বোধোদয় ঘটায়। তাঁর কাব্যে এর পরিচয় রয়েছে। জাতির নবজাগরণে তাঁর এই সাম্প্রদায়িক চেতনা জাত জাতীয়তাবোধ ক্রমপরিণতির ফলে মানববোধের উদ্বোধন করে—'মানুষের ধর্মে' তা বিশ্বমানবতায় উদ্বোধিত হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষে যে আন্তর্জাতিক মনোভাবের বিস্তার রবীন্দ্রনাথই তাব পুরোধা। এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বব্যক্তিত্বের রলাঁ, টলষ্টয়, গোর্কির সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে।

মানবজাতির মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে ভারতের রেনেসাঁস আন্দোলনের গতিবেগকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক শতাব্দীর তামসিকতায় অভিভূত— চৈতন্য ভারত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই প্রথম প্রাণের নিশ্বাস গ্রহণ করল। তাই ভারতীয় রেনেসাঁসকে রবীন্দ্র অব্দ নামে চিহ্নিত করা যায়।

ভারতীয় রেনেসাঁস রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। রাজনৈতিক আত্মসচেতনতা থেকে সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশ রূপ নিতে চেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভব ভারতীয় স্বাজাত্য অভিমান ও তাঁর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে। সমাজের থেকে মানুষ বড়—এ রবীন্দ্রনাথের কথা এবং ভারতীয় রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ভারতীয় প্রতিনিধি, যা বিশ্ব রেনেসাঁসে রূপান্তরিত হতে চলেছে। যাকে আমরা "হিউম্যানিজম" বলে জানি। পরাধীন ভারতের অপরিচিত অবহেলিত কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ এই হিউম্যানিজমের বাণী পৌঁছে দিলেন ভারতীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত হিসেবে।

বাংলা কাব্যে রোমান্টিসিজমের ভাববন্যা এনে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিস্ময়বোধ, বিষাদ, বিদ্রোহ, নিসর্গপ্রীতি, মানবপ্রেম, সুন্দরের উপাসনা, পলায়নী মনোবৃত্তি, আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা ও আদর্শবাদ প্রভৃতি রোমান্টিক কাব্যের লক্ষণ রবীন্দ্ররচনায় বিস্তৃত।

এসব সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের সুর প্রধানত মানবমুখীন। মানুষের পৃথিবীর তোরণ দ্বারে বসেই তিনি লিখেছেন জীবনের গান, যৌবনের গান, মানুষের গান। প্রথম জীবনে কবির কামনা ব্যক্ত হয়েছিল 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' আর যখন জীবন সায়াহ্ন ঘনিয়ে আসছে তখন তিনি বলেন—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরিচয়। (জন্মদিন)

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষত্ব এনে দিয়েছে অন্তঃস্তব্ধ ভাবগভীরতা, জগৎ ও জীবনের প্রতি ঋষিজনোচিত গভীরতার প্রজ্ঞাদৃষ্টি। সেই অনন্ত বিস্তারী দৃষ্টি দিয়ে কবি অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করেছেন জীবন থেকে মৃত্যুতে স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে, অতীতের তীর থেকে বর্তমানের উপকূলে। তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে। তাই সর্বত্র জানা অজানার দ্বন্দ্ব, রহস্য ভেদের তীব্র বাসনা।

রবীন্দ্রনাথের রহস্যবোধের উদ্বোধন প্রথম হয়েছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায়। কবি নতুন প্রভাতের আলোয় আপ্লুত হয়ে বিস্মিত পদক্ষেপে অভিযাত্রায় বেড়িয়েছেন। সে পদক্ষেপ কখনো বা উল্লাসদীপ্ত ছুটোছুটি কখনো তা আবেগের ভারে থেমেছে। কবি বিস্ময়ের তৃণশয্যায়, লুটিয়ে পড়তে চেয়েছেন। জীবনের কোন্ রুদ্ধ কক্ষে ঢুকে পড়েছে আলো—কবিমন চোখ মেলেছে। জ্যোতির্ময়ের সামনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এই বিস্ময় তাঁর কাব্যে গানে বহুধা—